দাম ২ টাকা

পৃথিবীর ডায়েরি

বছর ১৬, সংখ্যা: ১ | প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক পত্রিকা | এপ্রিল ২০১৫

জানা অজানা

সমুদ্রে প্লাস্টিকের পাহাড় বড় হচ্ছে

পৃথিবীর সমুদ্রগুলিকে আমরা আঁস্তাকুড় বানিয়ে ফেলেছি। সমুদ্রের জলে প্রতিদিন বিপুল পরিমান আবর্জনা গিয়ে পড়ছে। তার একটা বড় অংশ হল প্লাস্টিক। সমুদ্রে যে প্লাস্টিকের স্তূপ জমে উঠছে সে কথা আগেও জানা ছিল। এও জানা ছিল যে, তার ফলে জলের বাসিন্দা সব প্রাণীরা ক্রমেই বিপন্ন হয়ে পড়ছে। কিন্তু যা জানা ছিল না তা হল ঠিক কী পরিমান প্লাস্টিক সমুদ্রে পড়ছে। এখন তা জানা যাচ্ছে।

সম্প্রতি 'সায়েন্স' পত্রিকায় প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে যে, প্রতি বছর, প্রায় ৮০ লক্ষ মেট্রিক টন প্লাস্টিক আবর্জনা গিয়ে পড়ছে সমুদ্রে। অন্য দিকে প্লাস্টিকের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। মনে করা হচ্ছে ২০২৫ নাগাদ পৃথিবীর সমুদ্রগুলিতে জমে থাকা প্লাস্টিকের পরিমান গিয়ে দাঁড়াবে ১৫৫ কোটি মেট্রিক টন।

যতটা প্লাস্টিক সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে এখন, প্রায় ঠিক সমান ওজনের টুনা মাছ ধরা হয় প্রতি বছর, বলেছেন কারা ল্যাভেন্ডার ল, যিনি ওই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত। "অর্থাৎ, আমরা সমুদ্র থেকে টুনা মাছ তুলে নিচ্ছি আর তার জায়গায় প্লাস্টিকের আবর্জনা পুরে দিচ্ছি," বলেছেন ল।

এবার ২ পাতায়

ব্যথা লাগলে চিৎকার করে গাছ

পাতা ছিঁড়লে, ডাল কাটলে গাছেরা আর্তনাদ করতে থাকে, বলছেন উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা

গাছ থেকে ফুলটা ছিঁড়ে নিতে কি গাছটার লাগল? একটা সবুজ তরতাজা পাতা ছিঁড়ে ফেলায় সে কি ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল? ডালটা কেটে ফেলায় কি যন্ত্রনায় চিৎকার করে উঠল সে? এই কিছুকাল আগেও এ সব প্রশ্ন করলে হাসির খোরাক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল প্রশ্নকারীর। এখন এই সব প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছেন স্বয়ং বিজ্ঞানীরা। আর উত্তর খুঁজতে গিয়ে তাঁরা জেনেছেন, হ্যাঁ, গাছেরাও ব্যথা পায়। আর শুধু যে ব্যথা পায় তাই নয়, আঘাত তেমন গুরুতর হলে তারা তাদের মত করে আর্তনাদ করতে থাকে। আমরা, সাধারণ মানুষরা, তা শুনতে না পেলেও, জার্মানির বন ইউনিভারসিটির ইনস্টিটিউট অফ অ্যাপলায়েড ফিজিক্স-এর বিজ্ঞানীরা গাছেদের সেই চিৎকার শুনতে পেয়েছেন।

আগেই জানা গিয়েছিল যে তাদের সাঙ্কেতিক ভাষায় গাছেরা নিজেদের মধ্যে খবর আদান প্রদান করে। পোকার দ্বারা আক্রান্ত হলে তারা বাতাসে তাদের নিজস্ব কেমিক্যাল বা রসায়নিক পদার্থ ছড়াতে থাকে যা অন্য গাছেদের জানিয়ে দেয় সেই হানাদারির কথা। ফলে অন্যরাও তাদের শরীরে পোকা-তাড়ানো পদার্থের উৎপাদন বাড়িয়ে দিয়ে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।

কিন্তু গাছেদের ব্যথা পাওয়ার প্রমান পাওয়া গেছে সম্প্রতি। বন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দেখেছেন যে গাছ থেকে ফল বা ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে নিলে, অথবা ডাল কাটলে, রক্তের বদলে তাদের শরীর থেকে গ্যাস বেরতে থাকে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন এটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন অনেকটা ঘাস কাটলে একটা বিশেষ গন্ধ আমাদের নাকে আসে। সেটা আর কিছুই নয় প্রচুর ঘাসের কাটা অঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাস। শুধু তাই নয়। অতিশক্তিশালী লেজার মাইক্রোফোনের সাহায্যে তাঁরা শুনেছেন গাছেদের ক্ষতস্থান থেকে বেরতে থাকা গ্যাসের সোঁ-সোঁ শব্দ, আর তাকেই তাঁরা বলছেন গাছের আর্তনাদ। আর স্ট্রেস বা অস্বস্তি মাপার যন্ত্রের সাহায্যে তাঁরা দেখেছেন সে সময় গাছেদের শরীরে স্ট্রেসের মাত্রা অনেকটাই বেড়ে যায়।

অনেকে আবার গাছেদের ব্যথা অনুভব করার তত্ত্বটা মানতে রাজি নন। তাঁরা বলছেন যে গাছের তো মস্তিষ্কই নেই, তাহলে ব্যথা অনুভব

এবার ২ পাতায়

শহরের গাছেরা আর নির্বিঘ্নে ঘুমোতে পারে না

প্রকৃতির নিয়মেই, আলো আমরা সর্বক্ষণ সহ্য করতে পারি না। দিনের কয়েকটি ঘন্টা আমরা প্রতিদিন আলো নিভিয়ে অন্ধকারে নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে কাটাতে চাই। পৃথিবীর প্রায় সব প্রাণীই তাই চায়। কারণ, সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন জীবনছন্দ বাঁধা।

কিন্তু আমাদের শহরগুলি, যেখানে রাতভোর ঝলমল করে নানা রঙের কৃত্রিম আলো, সেখানে অনেক প্রাণীকেই নিঃশব্দে সহ্য করতে হয় আলোর নির্যাতন। শহরবাসির পক্ষে প্রয়োজনীয় হলেও, রাস্তার আলো, দোকানের বাতি, বিজ্ঞাপনের রকমারি নিয়ন শহরের গাছেদের জীবন দুঃসহ করে তুলেছে বলেই অভিমত দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। আর সেই

সব গাছেদের সঙ্গে নিপীড়নের শিকার হচ্ছে সেই পাখিরা যারা ওই গাছের ডালে বসে ঘুমতে আসে সূর্য ডুবে গিয়ে সন্ধ্যা নামলে। তবে শুধু গাছ আর পাখিরাই বা কেন, বলা হচ্ছে গাছের ওপর নির্ভরশীল বহু পোকামাকড় ও তার চেয়েও ক্ষুদ্র প্রাণী সব, তারাও রাতের আলোর দাপটে বিপন্ন হয়ে পড়ছে।

সম্প্রতি ইংলন্ডের এক্সেটার ইউনিভারসিটির বিজ্ঞানীরা বলেছেন শহরজুড়ে রাতের আলো গাছেদের বৃদ্ধি আর ফুল ফোটাকে বিশেষভাবে ব্যাহত করছে। আর সেই সঙ্গে অনেক ধরনের ফল যা পাখি আর পোকামাকড়ের খাদ্য, তার ফলনও কমছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে পারে ।

সূত্রঃ রেডঅরবিট.কম

সমুদ্রে প্লাস্টিক

১ পাতা থেকে

অপর এক গবেষক বলেছেন যে, দেখা যাচ্ছে, আগের ধারণার চেয়ে তিন গুণ বেশি প্লাস্টিক প্রতি বছর জমা হচ্ছে সমুদ্রের জলে।

গবেষকরা এও দেখেছেন যে এশিয়ার ঘন বসতিপূর্ণ উপকুল অঞ্চলে এই দূষণ বেশি ঘটছে। সব চেয়ে বেশি দূষণ ঘটছে চিনে। তারপর আছে ইন্দোনেশিয়া, দ্য ফিলিপাইনস, ভিয়েতনাম আর শ্রী লঙ্কা।

পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় ২৮ কোটি মেট্রিক টন প্লাষ্টিক আবর্জনা সৃষ্টি হয়। তার বেশিটাই পুঁতে ফেলা হয় মাটিতে। একটা ছোট অংশই গিয়ে পড়ে সাগরে। আর তাতেই বিপত্তি দেখা দিচ্ছে। সমুদ্রে প্লাস্টিক গিয়ে পড়লে তার কী পরিণতি হয় তাই নিয়ে চলছে গবেষণা। কিছু বিজ্ঞানী মনে করছেন যে সমুদ্রের তলায় যে সব ক্ষুদ্র প্রাণী আছে তারা প্লাস্টিকের বস্তুগুলিকে তাদের নিজস্ব রাসায়নিক বলে চূর্ণ করে দেয়। ফলে প্রায় ধুলোর মত প্লাস্টিকের কণা জলে মেশে, আর জল থেকে তা চলে যায় কেঁচো থেকে তিমি সব প্রাণীরই শরীরে। বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন যে সমুদ্র থেকে পাওয়া খাদ্য মারফৎ ওই প্লাস্টিক কণা মানুষের শরীরেও এক সময় প্রবেশ করতে শুরু করবে। তার ফলে মানুষের শরীরে কী ধরনের সমস্যা দেখা দেবে তা এখনই অনুমান করা যাচ্ছে না।

সূত্রঃ ডিসকভার

চাঙ্গা হতেই কি হাই তোলে মানুষ?

ক্লাসে বসে লেকচার শুনতে শুনতে কখন যে হাই ওঠে আমরা বুঝতেই পারি না। এক জন সাধারণ মানুষ দিনে ১৫ থেকে ২০ বার হাই তোলে। তবে কেবল যে মানুষই হাই তোলে এমনটা নয়। হাই তোলার দলে আছে আরও অনেকে - বড় বাঁদর, নানা স্তন্যপায়ী প্রাণী, সরীসৃপ, পাখি, এমনকী মাছও। এ কথা অবশ্য ঠিক যে তারা সকলেই যে মানুষের মত করে হাই তোলে এমনটা নয়। তাদের নিজ নিজ ভঙ্গী আছে। কিন্তু প্রশ্ন হল হাই কেন ওঠে, আর ক্লাসে বসে কোনও ছাত্র-ছাত্রীকে হাই তুলতে দেখলে অন্যদের মধ্যেই বা তা সংক্রমিত হতে থাকে কেন? একটা ধারণা অনেক দিন বেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। মনে করা হত ফুসফুসে অক্সিজেন-এর মাত্রা কমে গেলে, হাই তোলার মধ্যে দিয়ে তা আবার ঠিক যায়গায় ফিরে যায়। কিন্তু এখন ওই তত্ত্ব বাতিল হয়ে গেছে। তার কারণ জানা গেছে যে, শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা মাপার কাজটা ফুসফুস করে না। তার দায়িত্ব হল শুধু অক্সিজেন আর কার্বন ডাইঅক্সাইড আদান-প্রদান করা। তাছাড়া পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, যথেষ্ট পরিমান অক্সিজেন দেওয়া সত্ত্বেও হাই ওঠা বন্ধ হয় না। বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন আসলে হাই তোলার মধ্যে দিয়ে ব্রেন বা মস্তিষ্ক তার সুস্থ ভাব কাটিয়ে চাঙ্গা হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। তাই দেখা যায় ঘুম থেকে ওঠার পর বার বার হাই উঠতে থাকে, আর সেই ভাবে মস্তিষ্ক ঘুমের আমেজ কাটিয়ে দিনের জন্য তৈরি হয়ে ওঠে। এমনকী এও দেখা গেছে যে জন্মের আগে ভ্রুণ অবস্থাতেও বাচ্চাদের হাই ওঠে। তখন তো তার বাতাস থেকে অক্সিজেন নেওয়ার কোনও প্রয়োজন থাকে না।

কেন এমন হয়?

আবার এও মনে করা হয় কোনও গুরত্বপূর্ণ কাজ শুরু করার আগে হাই তোলার প্রবনতা দেখা দেয়। যেমন, কোনও বড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার আগে খেলয়াড়দের বা প্রোগ্রাম আরম্ভ করার জন্য স্টেজে ওঠার আগে সঙ্গীত পরিচালকদের হাই তুলতে দেখা যায়। অর্থাৎ, একটা বড়সড় কাজ শুরুর আগে মস্তিষ্ক নিজেকে সজাগ আর চাঙ্গা করে তোলার জন্য ওই পন্থা অবলম্বন করে। কিন্তু একজন হাই তুললে বাকিরাও একই রকম আচরণ করে কেন? একটি প্রচলিত মত হল, হাই তোলার মধ্যে দিয়ে একজন ব্যক্তির শরীরে জমে ওঠা ক্লান্তির ছবি ফুঠে ওঠে। আর তার প্রতি সহানুভূতি জানাতেই যেন অন্যরাও হাই তুলতে শুরু করে দেয়।

অগ্নীশ বড়ুয়া

গাছের ব্যথা

১ পাতা থেকে

করে তারা? কিন্তু অন্য এক দল বিজ্ঞানী, যাঁরা গাছের অনুভূতি নিয়ে গবেষণা করছেন তাঁরা বলছেন যে জীবজন্তুর মত তাদের নির্দিষ্ট একটি অঙ্গকে মস্তিষ্ক বলে চিহ্নিত করা না গেলেও গাছেরা কিন্তু বেশ বুঝেসুঝে কাজ করে। এক সময় বিশ্বের বিজ্ঞানীরা বিশ্বাসই করতেন না আর পাঁচটা প্রাণীর মত গাছেদেরও অনুভব শক্তি আছে। তাঁদের সেই ভুল ভেঙ্গে দিয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু। কলকাতায় তাঁর যুগান্তকারী গবেষণার ফল দেখিয়ে দেয় গাছেরা ঠান্ডা, গরম, আলো, অন্ধকার, শব্দ অনুভব করতে পারে। তাঁর তৈরি বিশেষ যন্ত্র ক্রেস্কোগ্রাফ-এ ধরা পড়ে আহত গাছের শরীরের তিরতিরে কম্পন। জগদীশচন্দ্রের মনে হয়েছিল গাছেরা ব্যথা অনুভব করে, স্নেহভালবাসা বুঝতে পারে।

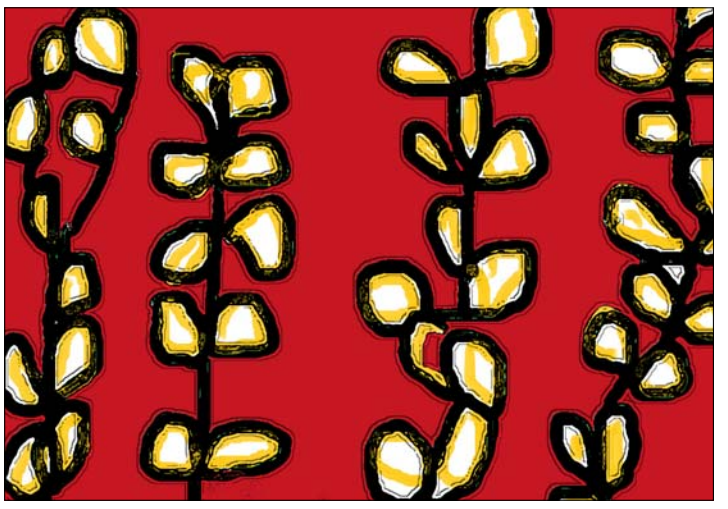

বন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা আজ যা জেনেছেন তা জগদীশ বসুর প্রায় একশ বছর আগেকার উপলব্ধিকেই সমর্থন করে। আজকের উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা বলছেন মস্তিষ্ক ছাড়াই গাছেরা এমন সব কাজ করে থাকে যা বুদ্ধিধর প্রাণীর পক্ষেই করা সম্ভব। তারা বুঝতে পারে মাটিতে সঞ্চিত জল কোথায় কতটা আছে, কোথায় মজুত আছে খাদ্য, কোথায় ছড়িয়ে আছে বিষাক্ত পদার্থ, বন্ধু জীবাণু আছে কত, এমনকী পাশের গাছটি তার সমগোত্রীয় না কি অন্য প্রজাতির কেউ, তাও তারা বুঝতে পারে। বিজ্ঞানীরা বলছেন বাঁচার রসদ নিয়ে ভিন্ন প্রজাতির গাছেদের মধ্যে রেষারেষি চলতে থাকে। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে একই টবে একই প্রজাতির কয়েকটি গাছ রাখায় তাদের প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তি কমে যায়। বরং যা আছে তা মিলেমিশে ভাগ করে নেয় তারা। তাই এক দল বিজ্ঞানী আজ বলছেন গাছেদের অনুভূতি যেমন আছে, তেমনই আছে "দেখে বুঝে" সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা যা এক ধরনের বুদ্ধিরই পরিচয় দেয়।

সূত্রঃ Do Plants Feel Pain - Laurie L. Dove, science.howstuff-works.com; The Intelligent Plant Michael Pollan, The New Yorker

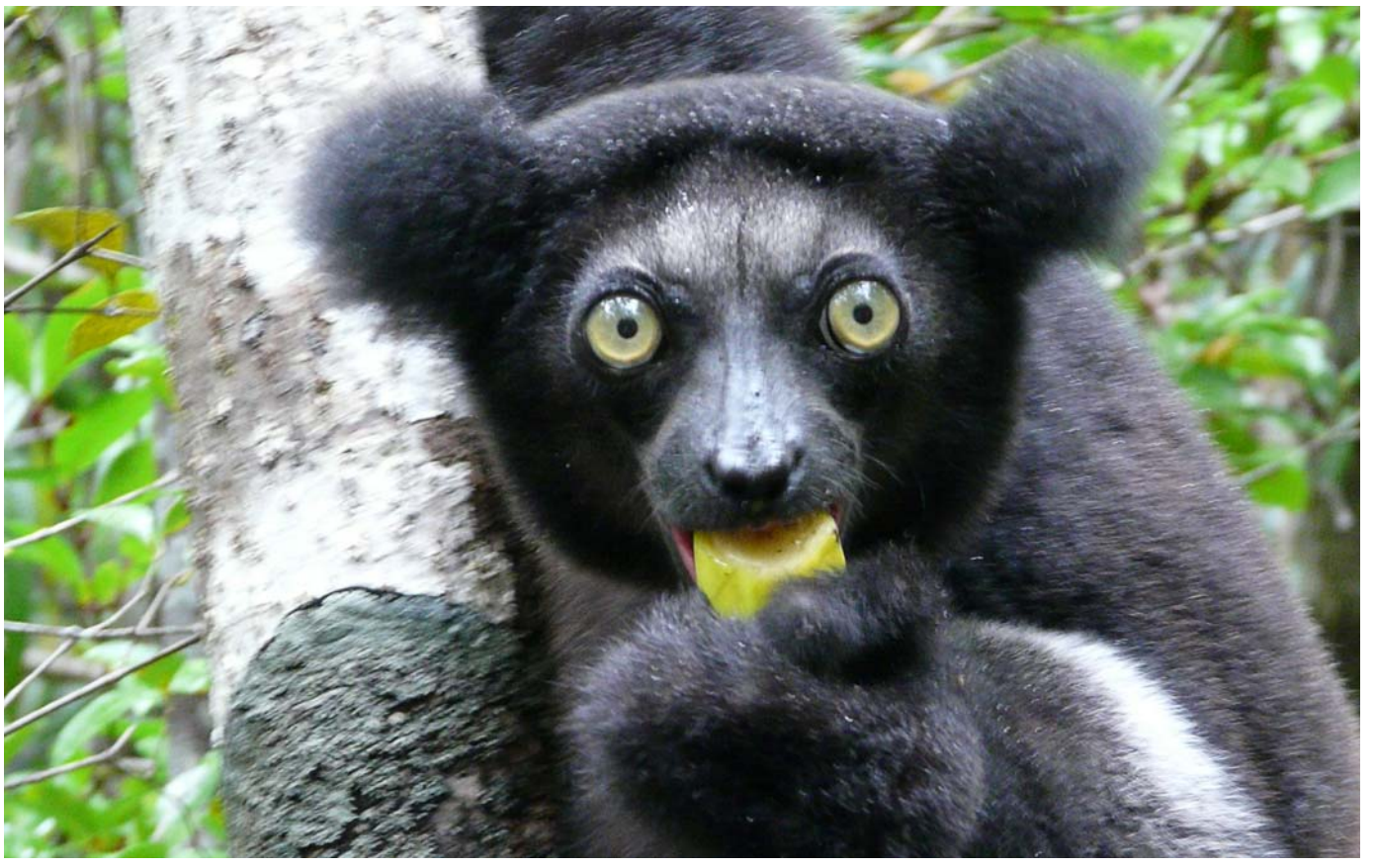

ইন্দ্রি

তাদের অনেক আচরণই মানুষের মত। মাদাগাস্কারের বাসিন্দা কোথাও কোথাও 'বাবাকোটা' নামেও পরিচিত এই ইন্দ্রি পৃথিবীর বৃহৎ লেঙ্গুরদের মধ্যে অন্যতম। তাদের বাসস্থান খুবই সঙ্কুচিত হয়ে আসায় তাদের চলাচলও সীমাবদ্ধ। তাই যেখানেই তাদের দেখা যায়, অনেকে একসঙ্গে থাকে। খুব উচ্চ স্বরে তারা ডাকাডাকি করে। তারা সারা জীবন একই সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সঙ্গে কাটিয়ে দেয়। প্রতি ২/৩ বছর অন্তর একটি করে বাচ্চা হয় মা ইন্দ্রির। ছানাদের বড় করে তোলায় বাবারাও বেশ সাহায্য করে। দেখা গেছে ইন্দ্রিদের পাবিারিক বন্ধন খুবই দৃঢ়।

জুতো আবিষ্কার হয় ৪০ হাজার বছর আগে

জুতো কত রকমের হয় – হাঁটার জুতো, ছোটার জুতো, ক্রিকেটের জুতো, ফুটবলের জুতো, ১০০ মিটার দৌড়ের জুতো, পাহাড়ে ওঠার জুতো, গ্রীষ্মের জুতো, বর্ষার জুতো, বরফের জন্য স্পেসাল জুতো, হয়ত বা আরও অনেক রকমের। কিন্তু পশ্ন, কতদিন হল জুতো পরছে মানুষ?

এক নতুন গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে যে জুতো পায়ে চলে বেড়ানর রেওয়াজটা হালের নয়। বলা হচ্ছে, মানুষের পায়ে পাদুকা এসেছে প্রায় ৪০ হাজার বছর আগে। সেকালের জুতো একালের মত দেখতে ছিল না ঠিকই কিন্তু কাজটা করত একই – পা দুটোকে রক্ষা করত আর পথ চলাকে করত সহনীয়। প্রাচীনতম যে জুতোর নমুনা পাওয়া গেছে তা প্রায় ১০,০০০ বছর পুরন।

নৃবিজ্ঞানীরা বলছেন যে জুতো মানুষের হাঁটা চলার ভঙ্গি পাল্টে দেয়, কারণ তা শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে, এমনকী পায়ের আকৃতির ওপরও প্রভাব খাটায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাটজার ইউনিভারসিটির নৃবিজ্ঞানী সুজান ক্যাচেল বলেছেন, পায়ের আকৃতি দেখলেই বোঝা যায় মানুষটি জুতো পরেন কি

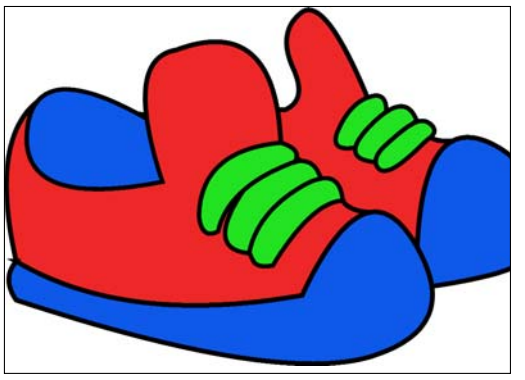

পরেন না। যারা জুতো পরে না তাদের পায়ের চেটো হয় চওড়া, আর আঙ্গুলগুলির মধ্যে ফাঁক থাকে বেশি। আর এই জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করেই নৃবিজ্ঞানীরা নির্ধারণ করেছেন জুতো আবির্ভাবের সেই সময়টা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট লুই ওয়াশিংটন ইউনিভারসিটির নৃতাত্ত্বিক এরিক ট্রিঙ্কস তাঁর গবেষণা থেকে জুতো ব্যবহার শুরুর সময়টা সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছেন। মানুষের নানা ফসিল পরীক্ষা করতে করতে ট্রিঙ্কস লক্ষ করেন যে ৪০ হাজার বছর আগে মানুষের পায়ের বুড়ো আঙ্গুল আগের তুলনায় ছোট হয়ে যায়। তার একটা বড় কারণ ছিল ওই সময় থেকে বুড়ো আঙ্গুলের ওপর কম চাপ সৃষ্টি হয় হাঁটাচলার ক্ষেত্রে। কিন্তু কী এমন ঘটল যে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের দিনকাল একটু সুখের হল, কাজ কমল তার, আর গুরত্ব কমায় আকৃতিও ছোট হল একটু। ট্রিঙ্কস বলেছেন ওই রহস্যের পেছনে ছিল একটাই জিনিসই – জুতো। জুতোই মানুষের চলাফেরা সহজ করে দেয় আর তার পায়ের আকৃতিতে আনে কিঞ্চিৎ বদল। আর সেটা ঘটে আজ থেকে ৪০ হাজার বছর আগে।

সূত্রঃ লাইভসায়েন্স

প্রতি বছর প্রায় ২ কোটি লক্ষ একর বন কাটা হচ্ছে

জেনে রাখা ভাল

অরণ্য ধ্বংস সারা পৃথিবী জুড়েই অব্যাহত।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা সংক্ষেপে ফাও'র হিসেব অনুযায়ী প্রতি বছর প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ একর অরণ্যাঞ্চল কেটে ফেলা হচ্ছে। আয়তনে যা হবে পানামা দেশের সমতুল। আরও জানা যাচ্ছে -

● পৃথিবীর মোট ট্রপিকাল বা ক্রান্তীয় অরণ্যের অর্ধেকই কেটে ফেলা হয়েছে।

যদিও সমস্ত ধরনের অরণ্যের ওপরই কোপ পড়ছে তবু ক্রান্তীয় বর্ষারণ্যই বন ধ্বংসের মূল লক্ষ।

● ব্রেজিল, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো, আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চল এবং পূর্ব ইউরোপের কিছু অংশেও বন ধ্বংস চলেছে।

● তবে সব থেকে বেশি অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ায়। যদিও নানা কারণেই জঙ্গল সাফ হচ্ছে, তবু দেখা গেছে অবৈধ ভাবে যত কাঠ কাটা হয় তার অর্ধেকই ব্যবহার হয় জ্বালানি হিসেবে।

● তবে চাষের জমি ও নগরায়ন বন ধ্বংসের বড় কারণ।

● এ ছাড়া তেলের জন্য পাম গাছের চাষ, কাগজ, আসবাব, গৃহ নির্মান ইত্যাদি বানিজ্যিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ব্যাপক হারে বন কেটে ফেলা হচ্ছে।

● অবশ্য বন ধ্বংসের পাশাপাশি বন সৃজনও হচ্ছে বটে, কিন্তু তা কখনওই প্রাকৃতিক অরণ্যের পরিপূরক হবে না।

সূত্রঃ লাইভসায়েন্স.কম

‘অমরত্বের উদ্ভিদ’ - আশ্চর্য গাছ ঘৃতকুমারী

এখন অবশ্য সাবান, শ্যাম্পু থেকে নানা প্রসাধনী সামগ্রী - সর্বত্রই তার উপাদান ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে ইজিপ্সিয়ানরা প্রায় ৬০০০ বছর আগেই তাকে ‘অমরত্বের উদ্ভিদ’ আখ্যা দিয়েছিল। আমেরিকার আদিবাসি বা রেড ইন্ডিয়ানরা তাকে মনে করত ‘স্বর্গের জাদু দন্ড’। আর গ্রিকরা না কি তাকে ব্যবহার করত ‘টাকে চুল গজানো থেকে অনিদ্রার ওষুধ’ তথা প্রায় সর্ব রোগহর হিসেবেই। এবং ভারতীয় আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় তার ব্যবহার তো চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। মনে হচ্ছে তো এ কোন উদ্ভিদ যার এমন অত্যাশ্চর্য সব গুণ! নাহ, মোটেই সে আমাদের অজানা অচেনা কেউ নয়, বরং আমাদের অনেকেরই অতি পরিচিত ঘৃতকুমারী বা অ্যালো ভেরা।

কয়েক হাজার বছর ধরে তার ব্যবহার চালু। তবে ২১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মেসোপটেমিয়ান মাটির ট্যাবলেটে উৎকীর্ণ ওষধি হিসেবে অ্যালো ভেরার নাম প্রথম প্রামানিক তথ্য হিসেবে উঠে আসে। অ্যালো ভেরা ব্যবহার শুরু হয়েছিল ইজিপ্ট বা মধ্যপ্রাচ্যতে। লোককাহিনি বলে ক্লিওপেট্রার রেশমসম কোমল ত্বকের গোপন রহস্য নাকি ছিল ওই অ্যালো ভেরা। প্রাচীন গ্রিসেও ক্ষত সারানোর জন্য এর ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

আসলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই যুগ যুগ ধরে সনাতনী চিকিৎসা ও রূপচর্চায় এর ব্যবহার চালু ছিলই। আমেরিকাতে এর ব্যবহার ১৮০০ শতাব্দীর প্রথম থেকেই হত। তবে অ্যালো ভেরা প্রথম বিশ্বের নজর কাড়ল বোধহয় তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। যখন ‘রে’ নেওয়ার ফলে এক রোগিনীর শরীরে মারাত্মক চর্মরোগ হওয়ায় অ্যালো ভেরা পাতার ভেতরের শাঁস দিয়ে তাঁর চিকিৎসা হয়। এবং তিনি সম্পূর্ণ নিরাময় হন। এই সাফল্য তার গুরুত্ব বাড়ায় এবং এই নিয়ে আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়।

ব্যথা যন্ত্রণা ও ক্ষতের উপশম ছাড়াও তার নানা ওষধি গুণের জন্যই বিজ্ঞানীদের গবেষণাগারে সে এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক উদ্ভিদ। মনে করা হয় সুদানই এর আদি জন্মস্থান। আফ্রিকার পূর্ব ও দক্ষিণ থেকে পরে পৃথিবীর সমস্ত উষ্ণ অঞ্চলেই সে ছড়িয়ে পড়ে। চিনে এবং দক্ষিণ ইউরোপের নানা দেশে তার ব্যবহার শুরু হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, মেক্সিকো, ব্রেজিল ইত্যাদি অন্যান্য দেশে মানুষই সাদরে নিয়ে গেছে ফ্যাটি অ্যাসিডস, এনজাইমস, অ্যামিনো অ্যাসিডস, নানান ভিটামিন ও খনিজে সমৃদ্ধ এই অ্যালো ভেরাকে নিজেদের প্রয়োজনে। জানা যায় ইজিপ্সিয়ান, আসিরিয়ান, মেডিটেরানিয়ান সভ্যতায় এর ব্যাপক ব্যবহার ছিল। অবশ্য ভারত, চিন, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিস ইত্যাদি দেশে এখনও সনাতনী চিকিৎসায় অ্যালো ভেরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে।

মালবী গুপ্ত

সূত্র: **www.ncbi.nlm.nih.gov, http://beforeitsnews.com,** এনসাইক্লোপিডিয়া.কম

বিচিত্র প্রাণী ইলি পিকা, মাত্র ২৯ দেখা গেছে

ভালুকও নয় আবার খরগোসও নয়। তবে যেন খরগোসের কাছাকাছি সে। উত্তর-পশ্চিম চিনে তিয়ানসান পর্বতমালার বাসিন্দা সেই নতুন প্রাণী ‘ইলি পিকা’কে লেন্স-বন্দি করতে গবেষকদের প্রায় কাল ঘাম ঝরে গিয়েছিল। প্রথম আবিষ্কারের দীর্ঘ ২০ বছর পর বহু চেষ্টায় গত বছর গ্রীষ্মে তাঁরা সফল হন।

আসলে ছোট্ট খুব মজার খরগোস ও ‘টেডি বেয়ার’এর মাঝামাঝি দেখতে এই বিরল স্তন্যপায়ী প্রাণীটিকে সবে মাত্র বছর তিরিশেক আগে আবিষ্কার করা গেছে। এবং আবিষ্কারের পর থেকে গবেষকরা এই প্রজাতির মাত্র ২৯ প্রাণীকে এই পর্যন্ত চিহ্নিত করতে পেরেছেন।

বিপন্ন যারা

জানা যাচ্ছে ২০০২ ও ২০০৩ সালের মধ্যে দুই গবেষক অ্যান্ড্রু স্মিথ ও লি ওয়েডং এই ইলি পিকাদের সংখ্যা ইত্যাদি নিয়ে সমীক্ষা চালাতে ১২ বিভিন্ন জায়গায় অন্তত বার সাতেক গেছেন। প্রায় ৩৭ দিন ধরে সমীক্ষা চালিয়েও তাঁদের শূন্য হাতেই ফিরতে হয়েছিল সে সময়, এতটাই বিরল প্রাণী সে। প্রাণীটি সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য তাই জানা যায় না।

তৃণভোজী এই প্রাণীটির কোনও আওয়াজ কেউ শোনে নি। তবে উইডং লি, যিনি ১৯৮৩ সালে ইলি পিকাকে হঠাৎই আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁর লেখা থেকেই জানা যায়

মাত্র ২০ সেন্টিমিটার মত লম্বা প্রাণীটির গায়ে ধূসর রঙের লোম, তাতে কিছু বাদামি ছোপ। কান দুটি বেশ বড়। লি বার কয়েক ওই অঞ্চলে গিয়ে বুঝেছিলেন সেখানে হাজার দুয়েক ইলি পিকা বাস করে। এবং এরা উত্তর আমেরিকার পাহাড়ি এলাকায় বাস করা পিকাদেরই জ্ঞাতিগুষ্টি হবে। এখন তাদের সংখ্যা খুব কমে গেলেও কোনও একটা সময় তারা নিশ্চয়ই বিপন্ন ছিল না। তবে ২০০৫ এ প্রকাশিত দুই গবেষক স্মিথ ও ওয়েডঙ নিজেদের গবেষণাপত্রে এই ইলি পিকাদের ‘বিপদগ্রস্ত’র বদলে ‘বিপন্ন’র তালিকাভূক্ত করারই পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ গত এক দশকে তাদের ৫৫%ই শেষ হয়ে গেছে। কোনও রোগ ব্যাধি, তাদের বসতি অঞ্চলের আশে পাশে মানুষের কার্যকলাপ বৃদ্ধি বা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব - যে কোনও কারণেই হোক তাদের সংখ্যা কমেই চলেছে।

সূত্রঃ আর্থটাচনিউজ.কম, বিজনেসইনসাইডার.ইন

বাঘ খেকো মানুষ

বাঘের মাংস খাওয়া ও বাঘের রক্ত দিয়ে ওয়াইন তৈরির জন্য চিনের এক ধনী ব্যবসায়ীর ১৩ বছরের জেল হয়েছে। রয়টার'এ প্রকাশিত, চিনের 'জিনহুয়া' সংবাদ সংস্থাই এই খবর দিয়েছে। ওই ব্যক্তির নাম জানা যায় নি, পদবী জানা গেছে - জু।

জু তার সাগরেদদের নিয়ে চোরা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তিনটি বাঘের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে। জানা যায় তাদের মধ্যে একটি বাঘকে মারা হয়েছিল ইলেকট্রিক শক দিয়ে। বাঘগুলিকে কোথা থেকে আনা হয়েছিল রিপোর্টে তার উল্লেখ নেই। তবে সন্দেহ করা হচ্ছে যে, দেশের মধ্যেই চোরা শিকারিদের কাছ থেকে তাদের কেনা হয়েছিল। আসলে চিনে এখনও কিছু মানুষের বিশ্বাস যে বাঘের মাংস খুব বলবর্ধক। তাই সেখানে তার চাহিদাও খুব যা মেটাতে গিয়ে বাঘ সেখানে প্রায় নিঃশেষ। এবং পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম বাঘ প্রজাতি, যা মধ্য ও দক্ষিণ চিনের একদম নিজস্ব, আশঙ্কা করা হচ্ছে তা বিলুপ্তই হয়ে গেছে।

সমুদ্রের ক্লাউন বলে পরিচিত পাফিন

অদ্ভুৎ মজার দেখতে বলেই বোধহয় তাকে 'ক্লাউনস অফ দ্য সি' বলা হয়। অবশ্য আর একটা নামেও তাকে ডাকা হয়, 'সি প্যারটস'। কমলা রঙের মোটা ঠোঁট, পা দুটো হাঁসের মত, পিঠটা কালো আর বুক পেট সাদা - দেখতে খুবই মজার। অনেকটা যেন কার্টুন বা কমিক্স'র কোনও চরিত্র সে। নাম তার পাফিন। প্রজননের মরশুম এলেই তাদের মোটা ঠোঁট হয়ে ওঠে উজ্জ্বল কমলা রঙের।

ছোট্ট ছোট্ট ডানা, ছোট্ট ছোট্ট লেজের অধিকারী এই পাফিনরা তিন প্রজাতির। টাফটেড ও হর্ন এই দু রকমের পাফিনদের উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল তথা আলাস্কা, সাইবেরিয়া, ব্রিটিশ কলম্বিয়া, ক্যালিফর্নিয়া ইত্যাদি জায়গায় দেখা যায়। আর আটলান্টিক পাফিনদের দেখা যায় উত্তর আটলান্টিক অর্থাৎ উত্তর ইউরোপ, ফ্রান্স, ব্রিটেনের দ্বীপগুলিতে, আইসল্যান্ড, গ্রিনল্যান্ড, নরওয়ে ইত্যাদির উপকূল অঞ্চলে।

এই সাগর পাখিরা সমুদ্রে সাধারণত চুপচাপই থাকে। কিন্তু প্রজননের সময় এলেই তারা দ্বীপভূমিতে বা সমুদ্র সৈকতে উঠে আসে এবং বিরাট কলোনি গড়ে তোলে। আর তখন তাদের কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে চারপাশ। দারুন সাঁতারু আটলান্টিক পাফিনদের জীবনের বেশিরভাগ সময়টাই সাগরে কেটে যায়। সাধারণত বসন্ত ও গ্রীষ্মে তারা কলোনি গড়ে তোলে। এবং দেখা গেছে আইসল্যান্ডই আটলান্টিক পাফিনদের ৬০ শতাংশের আঁতুড়ঘর। বসন্তকালই পাফিনদের প্রজননের পক্ষে সব থেকে ভাল সময়। প্রতিবছর ব্রিটেনের দ্বীপগুলিতে প্রায় ২ কোটি আটলান্টিক পাফিনের আগমন ঘটে। এই প্রজননের সময় তাদের দেহের রঙ রূপ বদলে অনন্য হয়ে ওঠে তারা। নানা রঙে ঠোঁট হয়ে ওঠে উজ্জ্বল বর্ণময়, পুরনো ঝরে গিয়ে গজিয়ে ওঠা নতুন পালকে তারা পরস্পরের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

মেয়ে পাফিন একটাই ডিম পাড়ে। তবে মা বাবা পালা করে ডিমে তা দেয়। ডিম ফুটে বাচ্চা বার হলে বাবা মাই সমুদ্র থেকে ছোট ছোট মাছ ধরে এনে ছানাকে খাওয়ায়। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় যে প্রতি বছর সঙ্গীরা পরস্পরের সঙ্গে একই জায়গায় আবার মিলিত হয়। কীভাবে তারা যে বাড়ি ফিরে আসে সে সম্পর্কে এখনও স্পষ্ট জানা যায় নি। হয়তো কোনও দৃশ্য চিহ্ন, গন্ধ, শব্দ বা তারা'দের দেখে পথ চিনে চিনে ঘরে ফিরে আসে তারা।

কৌশিক রায়, সূত্রঃন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

বাঘের দেশে যাওয়ার আগে পড়তেই হবে

বই পরিচয়

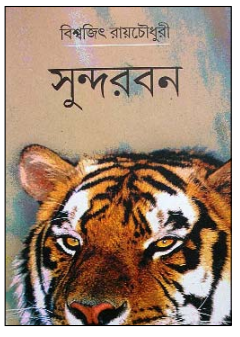

যদিও অনেকের কাছেই তার প্রধান আকর্ষণ রয়েল বেঙ্গল টাইগার, তবু তার আঁকে বাঁকে নানা অজানা অচেনা রহস্য যেন সদাই উন্মোচনের অপেক্ষায় থাকে। বস্তুত সেই বিশ্ব ঐতিহ্য স্থল সুন্দরবন'র জীবজন্তু, গাছপালা, ফুল, ফল মাছ, পাখি, পোকা মাকড় তথা সেখানকার সমস্ত বাসিন্দার সম্পর্কে কত কিছুই না অজানা ছিল। সদ্য প্রকাশিত বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরীর 'সুন্দরবন' সংক্ষেপে হলেও তার যেন একটা আভাস দিল। যেমন, কে জানত ভূত কাঁকড়া, সন্ন্যাসী কাঁকড়া, গিটার মাছের কথা? চিনতাম না তো সুন্দরী ফুল, গোলপাতা ফল, গেছো ব্যাঙ, সিন্ধু গরুর কিম্বা ভূতুম পেঁচাকে? হলুদ-কালো ডোরার রাজকীয় ঐশর্য' পাশাপাশি এদের মত আরও অনেকেই যে এই অসাধারণ জীব বৈচিত্রে সমৃদ্ধ-বাদাবনের সদস্য-একশ ছিয়াত্তর পাতার বইটি প্রচুর ছবি সহ সেই তথ্য সামনে আনল।

মালবী গুপ্ত

সুন্দরবন/বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী
প্রকাশক: নান্দনিক
দাম: ৩০০ টাকা

এডু ম্যাজিকো উৎসব

২০১৪–২০১৫

বসে আঁকো ● আবৃত্তি ● ক্যুইজ প্রতিযোগিতার ফলাফল

আয়োজক
আলোকরেখা, শ্যামপুর, বজবজ, কলকাতা - ১৩৭
এবং
নেচার এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ওয়াইল্ডলাইফ সোসাইটি
১০, চৌরঙ্গী টেরাস, কলকাতা-২০

****

বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

১) সম্পূর্ণা সাহা (ক) সাউ পাইলক স্কুল
২) রোশনী দাশগুপ্ত (ক) বিবেকানন্দ মিশন স্কুল
৩) প্রত্যুষা খাঁ (ক) সাউ পাবলিক স্কুল

****

১) তপন বর্মন (খ) অমৃতা বিদ্যালয়ম্
২) সায়নী দাস (খ) চকগোপাল সারদা বিদ্যাপীঠ
৩) অভিত মন্ডল (খ) খড়িবেড়িয়া বিবেকান্দ বিদ্যাপীঠ
৪) ঋতু কর্মকার (খ) সেন্ট স্টিফেনস্ স্কুল
৫) পৌলম সামন্ত (খ) বাওয়ালী হাই স্কুল

****

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

১) সিদ্ধার্থ কর্মকার (ক) সেন্ট যোশেফ অ্যান্ড মেরীস্ স্কুল
২) শ্রেষ্ঠা অধিকারী (ক) মহেশতলা হাই স্কুল (প্রাথমিক)
৩) সৈমন্তী সরকার (ক) বিদ্যাভারতী স্কুল

****

১) পিউ কয়াল (খ) বাটানগর গার্লস হাই স্কুল
২) শিঞ্জিনী কয়াল (খ) ইউনাইটেড মিশনারী গার্লস হাই স্কুল
৩) অনন্যা মন্ডল (খ) বাটানগর গার্লস হাই স্কুল
৪) তনিমা গুড়িয়া (খ) কারমেল স্কুল

****

১) গার্গী জানা (গ) বজবজ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
২) ঝুমা কর্মকার (গ) যজ্ঞেশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
৩) অদিত্যাশ্রী বাসু (গ) বাটানগর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

****

ক্যুইজ প্রতিযোগিতা

১) রিপন দে (ক) নঙ্গী হাই স্কুল
২) অভয় ঘোড়ুই (ক) নঙ্গী হাই স্কুল
৩) অর্জুন মিত্র (ক) নঙ্গী হাই স্কুল

****

১) সৈকত সিন্হা (খ) নঙ্গী হাই স্কুল
২) মঃ হাফিজ মোল্লা (খ) খড়িবেড়িয়া বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ
৩) পীযুষকান্তি দাস (খ) নঙ্গী হাই স্কুল

****

১) বিধান চন্দ্র অধিকারী (গ) শিক্ষক
২) অগ্নিদেব মন্ডল (গ) বাওয়ালী উচ্চ বিদ্যালয়
৩) অতীন সাশমল (গ) নঙ্গী হাই স্কুল

RNI Regn No. WBBEN/2000/1531 Date of Publication: April 1, 2015 Postal Regn No.KOL RMS/262/2013-15

অবাক পৃথিবী

● পুরুষ সিংহরা যতই পশুরাজ হয়ে জঙ্গল শাসন করুক না কেন সিংহীরা কিন্তু সিংহের তুলনায় অনেক দক্ষ শিকারি।

● পেরুতেই প্রথম আলুর চাষ হয়েছিল প্রায় ৭০০০ বছর আগে।

● ঘোড়া এবং গরু কিন্তু মানুষের মতো শুয়ে নয়

দাঁড়িয়ে ঘুমোয়।

● সিংহের গড় আয়ু ১৫ বছর হলে কি হবে গ্যালাপাগোসের কচ্ছপ কিন্তু গড়ে ২০০ বছেররও বেশি বাঁচে।

● দাঁতের জন্যই চোরা শিকারিরদের হাতে প্রতি বছর আফ্রিকায় হাজার হাজার হাতি নিধন হচ্ছে। কিন্তু চিবোনোর জন্য সেই হাতিদেরই সাকুল্যে মাত্র ৪ দাঁত থাকে।

● পৃথিবীতে প্রায় ৭৩ হাজার রকমের মাকড়শা আছে।

যদি ডাইনোসর আসে

কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি দেখা যায় বিরাট এক ডাইনোসর জানলার পাশে মুখ বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কেমন হবে ব্যাপারটা? বিজ্ঞানীরা বলছেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? ডাইনোসরদের সঙ্গে তো আমাদের দিনে রাতে রোজই দেখা হচ্ছে। যে কাক, শালিক, চড়াই আমাদের চারপাশে উড়ে বেড়ায় বা যে টিকটিকিটা ঘরের দেওয়ালে পোকার আশায় স্থির হয়ে বসে থাকে তারা তো সবাই সেই সেকালের প্রকান্ড প্রাণীদেরই ক্ষুদে সংস্করণ। কিন্তু তাদের নিয়ে আমাদের কোনও মাথা ব্যথা নেই। চিন্তা তো সেই তিনতলা সমান প্রকান্ডদের নিয়ে যাদের আবার ফিরিয়ে আনার জল্পনা-কল্পনা চলছে।

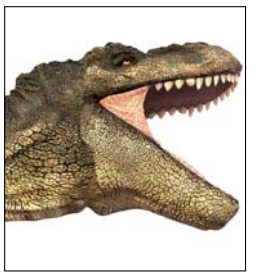

এক দল বিজ্ঞানীর তো স্থির বিশ্বাস যে টিরেনোসর-রেক্স-এর মত ছ' কোটি বছর আগেকার সেই দৈত্যাকায়, শাবলের মত দাঁতধারী প্রাণীটিকে, বিজ্ঞানের কারসাজিতে, আবার পুণর্জন্ম দেওয়া যায়। তাই যদি হয়, তা হলে আটকাচ্ছে কোথায়? ডিএনএ-তে। বিজ্ঞানীরা বলছেন যে তাদের অনেক ফসিল মিলেছে ঠিকই, কিন্তু তেমন যুৎসই ডিএনএ মিলছে না, যা দিয়ে আবার রক্তমাংসের ডাইনোসর সৃষ্টি করা যাবে। ঠিকই। ছ' কোটি বছরের পুরানো ফসিল-হওয়া প্রাণীর টাটকা ডিএনএ মেলা দুষ্কর। কিন্তু ধরা যাক পাওয়াও গেল, টেস্টটিউবের ডাইনোসর হুংকার দিয়ে রাজপথে নেমেও এল একদিন। তারপর?

অপর এক দল বিজ্ঞানী আশ্বাস দিয়ে বলছেন, ভয় নেই। ওরা ছিল ছ' কোটি বছর আগে। তারপর পৃথিবী অনেক পাল্টে গেছে। এটা নানা দূষণের যুগ। তার ওপর এখন পৃথিবী জুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে হরেক রকম মারাত্মক আর অতি আধুনিক সব ভাইরাস আর ব্যাক্টিরিয়া। তাদের হাতে সে মারা পড়বে অচিরেই, আর বিলুপ্ত হয়ে যাবে আবারও।

সূত্র: science.howstuffworks.com

পৃথিবীর ডায়েরি

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩০ টাকা (ডাক মাশুল সহ)

স্কুল, কলেজ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যে কোনও অন্য সংস্থা অথবা ব্যক্তিবিশেষ এই পত্রিকার গ্রাহক হতে পারেন। মানি-অর্ডার বা চেক দ্বারা টাকা পাঠান। চেক লিখবেন Prithibir Diary নামে।

যোগাযোগের ঠিকানা:
প্রকাশক
পৃথিবীর ডায়েরি
সি-এল ২৫৫, সেক্টর-২, সল্ট লেক, কোলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪/৯৪৩৩০৪৬৬৯৫

পাতিরাম

(কলেজস্ট্রিট–হ্যারিসন রোাড ক্রসিং)
পৃথিবীর ডায়েরি পাওয়া যায়

ক্যুইজ?!?!

১। নীচের চার তথ্য কোন শহরের বিষয়ে?
(ক) এক মুঘল রাজপুত্র যিনি সম্রাট হন নি, তাঁর নামে নাম (খ) রামগঙ্গা নদীর ধারে (গ) এক প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট ক্যাপটেন এখান থেকে সংসদ সদস্য হয়েছিলেন (ঘ) পিতল'র হস্তশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ

২। কোন সংস্থার আদর্শ - বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়
(ক) ভারতীয় রেল (খ) জীবনবিমা সংস্থা (গ) আকাশবানী (ঘ) স্বল্পসঞ্চয় সংস্থা

৩। স্পাইসেস বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের নাম কি?
(ক) সুগন্ধ ভবন (খ) মশলা মহল (গ) টক ঝাল মিষ্টি হাউস (ঘ) গরম মশালা

৪। আয়তনে পৃথিবীর সব থেকে ছোট দেশ কোনটি?
(ক) বানুয়াতু (খ) সিঙ্গাপুর (গ) ভাটিকান (ঘ) মোনাকো

৫। ভারতের অধিকাংশ তিব্বতী বৌদ্ধরা থাকেন লাদাখ, হিমাচল প্রদেশ এবং সিকিমে। সেই জন্য ওই সব জায়গাতে তাঁদের একটি প্রধান উৎসব লোসার খুব ঘটা করে পালিত হয়। লোসার কিসের উৎসব?
(ক) নববর্ষ (খ) বর্তমান দালাইলামার জন্মদিন (গ) বুদ্ধদেবের বোধিলাভ (ঘ) লাসার পোতালা প্রাসাদ নির্মাণ যে দিন শেষ হয়

৬। আবেরদিন স্কটল্যান্ডের একটি প্রধান শহর। কিন্তু ১৮৫৯ সালে ভারতে এক অঞ্চলের একটি সশস্ত্র সংঘর্ষকে আবেরদিনের যুদ্ধ বলা হয়। কোথায় ওই লড়াইটা হয়েছিল?
(ক) নাগাল্যান্ড (খ) আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (গ) মীরাট (ঘ) পেশোয়ার

৭। ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত কোন দুই দেশের সীমান্তে?
(ক) নামিবিয়া আর বৎসোয়ানা (খ) দক্ষিণ আফ্রিকা আর মোজাম্বিক (গ) তানজানিয়া আর মালাওয়াই (ঘ) জাম্বিয়া আর জিম্বাবোয়ে

৮। ছেলেবেলাতে অন্ধত্বের একটি প্রধান কারণ খাদ্যে কিসের অভাব?
(ক) লোহা (খ) ভিটামিন এ (গ) ভিটামিন বি ৩ (ঘ) ভিটামিন ডি

৯। কোন তথ্যটি ঠিক নয়?
(ক) খরগোস জন্মানোর সময় অন্ধ থাকে (খ) ইঁদুর দশ বছর অবধি বাঁচে (গ) কুমিরের কোনও সোয়েড গ্রন্থী নেই তাই তারা মুখ দিয়ে গায়ের উত্তাপ বার করে দেয় (ঘ) মাছির দু'জোড়া পাখা থাকে

১০। সব শুদ্ধ ১২ জন ব্যাটসম্যান, বাকি ৯ টেস্ট খেলা দেশের প্রত্যেকটির বিরুদ্ধে শত রান করেছেন। সব থেকে কম ইনিংস খেলতে হয়েছে কাকে?
(ক) ইউনিস খান (খ) কুমার সঙ্গাকারা (গ) মাহেলা জয়বর্ধনে (ঘ) অ্যাডাম গিলখ্রিস্ট

উত্তর: ১/মোরাদাবাদ; ২/গ; ৩/ক; ৪/গ; ৫/ক (তিব্বতী ভাষায় লো মানে নতুন আর সার মানে বছর); ৬/খ (পোর্টব্লেয়ারে যে অঞ্চলে ইংরেজ সৈন্য আর আন্দামানের তৎকালীন বৃহত্তম জনগোষ্ঠির মধ্যে লড়াই হয়েছিল, তার নাম সাহেবরা দিয়েছিল আবেরদিন); ৭/ঘ; ৮/ঘ; ৯/খ(ইঁদুরের গড় আয়ু চার মাস মতন, তবে মানুষের তত্ত্বাবধানে থাকলে আড়াই বছর পর্যন্ত বাঁচে দেখা গেছে); ১০/খ ।

স্বত্বাধিকারি মালবী গুপ্তর পক্ষে অনীশ গুপ্ত দ্বারা ইন্সট্যান্ট প্রিন্ট. ৭০এ, এস.এন. ব্যানার্জি রোড. কোলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক: মালবী গুপ্ত। যোগাযোগ: সি-এল ২৫৫, সল্টলেক-২, কলকাতা-৭০০০৯১। ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪। ই-মেল: prithibir_diary@rediffmail.com